যাদু কাহিনী

যাদু কাহিনী

অজিত কৃষ্ণ বসু

[অ. কৃ. ব.]

KOBI PROKASHANI

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা ৭
একজন যাদুকরের কথা ২১
অদ্বিতীয় হ্যারি হুডিনি ৩০
যাদুকর গণপতি ৪৬
শয়তান ও ম্যাসকেলিন ৫৫
একটি অভিশপ্ত খেলা ৭১
চুং লিং সু ৭৭
ডেভিড ডেভান্ট ৯২
আদালতে যাদুকর ৯৭
উত্তর দেশের যাদুকর ১০৬
যাদুজগতের আষাঢ়ে গল্প ১১৪
আসল ও মেকি ১২৯
ফরাসি যাদুসম্রাট উদ্যাঁ ১৩৭
কাউন্ট ক্যালিওস্ট্রো ১৫০
দুটি অলৌকিক কাহিনি ১৫৯
খেয়ালী যাদুকর ১৭৩
বেকায়দায় যাদুকর ১৮৭
কয়েকটি যাদুখেলার কথা ১৯৬
কয়েকটি কথা ২১৫
বিদেশিদের দৃষ্টিতে পি. সি. সরকার ২২২
যাদুসম্রাটের মৃত্যু ২৩১

প্রস্তাবনা

যাদুর কাহিনিই দুনিয়ার সবচেয়ে পুরনো কাহিনি, আর ঈশ্বরই হচ্ছেন দুনিয়ার সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর। তাঁরই যাদুতে অনন্ত শূন্যের বুকে সৃষ্ট হয়েছিল বিস্ময়ে ভরা এই বিশ্ব। ঈশ্বর-সৃষ্ট বিষয়গুলো যুগের পর যুগ দেখতে দেখতে ক্রমে বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেল মানুষের চোখ থেকে আর মন থেকে। ঈশ্বরের যাদু ভুলে মানুষ তখন মানুষের যাদুতে মুগ্ধ হতে শুরু করল।

মানুষের সমাজে প্রথম যাদুকরেরা ছিলেন পুরোহিত, পূজারি 'প্রফেট' বা গুরুজাতীয় অসাধারণ ব্যক্তি। সাধারণের অনধিগত বিশেষ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে সম্পূর্ণ লৌকিক উপায়েই এঁরা যেসব রহস্যময় ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করতেন, সেসব কিছুই সাধারণ মানুষ ভীতি এবং শ্রদ্ধা-মেশানো বিস্ময়ের চোখে দেখে ভেবে নিত এঁরা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, ঐশ্বরিক যাদুক্ষমতার অংশীদার। এই যাদুকরদের যাদুপ্রদর্শনের উদ্দেশ্য ছিল মনোরঞ্জন বা চিত্তবিনোদন নয়, অলৌকিক রহস্যময় শক্তির অভিনয়ে অভিভূত এবং বশীভূত করে সাধারণ মানুষদের ওপর আধ্যাত্মিক বা অন্যপ্রকার প্রভাব বিস্তার করা। তারপর যাদুবিদ্যা ক্রমে ক্রমে অলৌকিকতার এলাকা ছাড়িয়ে চলে এসেছে লৌকিক মনোরঞ্জনের এলাকায়। যাদুবিদ্যার ইতিহাস এই ক্রমবিবর্তনেরই ইতিহাস। যাদুকরের আশ্চর্য কাণ্ডকারখানা দেখে আমরা বিস্মিত হলেও তাঁকে অলৌকিক বা ভৌতিক ক্ষমতার অধিকারী বলে ভাবি না, মনে মনে জানি তিনি সূক্ষ্ম কৌশলে আমাদের চোখ আর মনকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়েছেন মাত্র; যা সত্যি সত্যি ঘটেছে (অথচ ঘটেছে বলে আমরা বুঝতে পারিনি ঠিক কোথায় সেই তফাতটা। 'নিজের চোখে দেখলাম, অবিশ্বাস করি কী করে?' এ ধরনের উক্তি করা যে কত বড় বোকামি, সেইটে বুঝতে পারি যাদুকরদের যাদুর খেলা দেখে।...

আমার দেখা প্রথম যাদুকর 'রয় দি মিস্টিক'—বাংলা তর্জমায় যার মানে 'অতীন্দ্রিয়বাদী রায়'। তাঁকে প্রথম দেখলাম এক সন্ধ্যায় ঢাকা শহরে রেলওয়ে ইনস্টিটিউট হলে। তিনি ঘণ্টা দুয়েক যাদুখেলা দেখালেন পাশ্চাত্য পোশাকে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে। বছরটা ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ, কিন্তু সেই সুদূর সন্ধ্যার স্মৃতি এমন মধুর স্বপ্নময় বিস্ময়ে ভরা যে, এখনও মন থেকে মুছে যায়নি। নয়ন-মনোহারিণী রূপসী সহকারিণী ছিল না তাঁর, শুধু অপরূপ যাদুপ্রদর্শনের আকর্ষণে তিনি হলসুদ্ধ

সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন। যে খেলাগুলো দেখিয়েছিলেন তাদের কয়েকটি হচ্ছে বিলিয়ার্ড বলের খেলা (মাল্টিপ্লাইং বিলিয়ার্ড বল্‌স্‌), চাইনিজ লিংকিং রিংস্‌ (দশ-বারো ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত কতকগুলো বড় রিং আলাদা আলাদা দেখিয়ে একটির ভেতর আরেকটি রহস্যজনকভাবে ঢুকিয়ে দিয়ে আবার বিচ্ছিন্ন করা), শূন্যে ভাসমান বল, মার্কিন যাদুকর হাউয়ার্ড থার্সটনের বিখ্যাত 'রাইজিং কার্ডস্‌' (বাঁ হাতে ধরা প্যাক থেকে পরপর কয়েকটি তাসের ধীরে ধীরে শূন্যপথ বেয়ে ডান হাতে উঠে আসা), 'এরিয়্যাল সাসপেনশন' (একটি বালিকাকে হিপ্‌নোটাইজ করে শুধু একটি খাড়া লাঠির ডগায় কনুই ভর করে শূন্যে ভাসিয়ে রাখা এবং তারপর ঐ লাঠিটিও সরিয়ে নিয়ে একেবারে শূন্যে ভাসিয়ে রাখা), মেন্টাল টেলিপ্যাথি বা সেকেন্ড সাইট (দর্শকদের ভেতরে দাঁড়ানো যাদুকরের হাতে দর্শকেরা যেকোনো জিনিস দিলে মঞ্চে চোখ বাঁধা অবস্থায় সহকারীর দ্বারা সে জিনিসটির বিশদ বর্ণনা) ইত্যাদি। পর্দা ওঠবার পরই আমাদের অভিবাদন করে একটির পর একটি এমন সব তাজ্জব ব্যাপার দেখিয়ে তিনি আমাদের তাক লাগিয়ে দিলেন যে, তারপর মনে হতে লাগল এই মায়াবী লোকটি যা খুশি তাই অনায়াসে করতে পারেন, নাপোলেয়ঁর মতো এর অভিধানেও 'অসম্ভব' শব্দটি অনুপস্থিত।

যে খেলাগুলো তিনি দেখাচ্ছিলেন তার কোনো লৌকিক ব্যাখ্যা শুধু আমার কেন—আমি তো তখন বালক মাত্র, সবে স্কুলের ছাত্রগিরি শুরু করেছি—আমার আশপাশের বড়দের মাথায়ও আসেনি; তাঁরা হতভম্ব হয়ে মাথা চুলকোচ্ছিলেন। তবু কিন্তু 'রয় দি মিস্টিক'কে অলৌকিক, ভৌতিক বা 'তান্ত্রিক' ক্ষমতার অধিকারী বলে আমার মনে হয়নি।

এর একটি কারণ হচ্ছে যাদুকরের বেশভূষা এবং যাদুপ্রদর্শনের স্টাইল সম্পূর্ণ আধুনিক, ঘরোয়া, অন্তরঙ্গ। মুখে অলৌকিক রহস্যময় গাম্ভীর্যের বদলে ছিল সকৌতুক হাসির আলো। কথায় কথায় আমাদের হাসাচ্ছেন—আমাদের আনমনা করে দিয়ে সেই ফাঁকে ফাঁকির কাজ চুপি চুপি হাসিল করে নেবার জন্যই বোধহয়—আর আমাদের সঙ্গে যেন আমাদেরই একজন হয়ে প্রতিটি খেলার তামাশা আমাদেরই মতো রসিয়ে বসিয়ে উপভোগ করছেন। তিনি আমাদের ঠকিয়ে মজা পাচ্ছেন, আর আমরা ঠকে মজা পাচ্ছি; ওঁর ঠকানো, অতএব আমাদের ঠকার মাত্রা যত বাড়ছে, আমাদের দুপক্ষেরই মজার মাত্রাও যেন ততই বেড়ে উঠছে। এ আবহাওয়ায় অলৌকিকতা বা ভৌতিকতার ঠাঁই কোথায়? যাদুকর ভদ্রলোকের যা কিছু গুরুগম্ভীরত্ব ছিল ঐ 'মিস্টিক' বিশেষণেই।

আরেকটি কারণ, যাদুবিদ্যার সমস্ত বিস্ময়ই যে সম্পূর্ণ 'লৌকিক' কৌশলের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যাদুবিদ্যায় অলৌকিক কিছু নেই, এ জ্ঞান আগেই পেয়েছিলাম 'গ্যাম্যাজিক' (Gamagic) নামক একটি পুরনো বৃহদায়তন সচিত্র ক্যাটালগ গ্রন্থ থেকে। আবোল তাবোলের 'হাঁস ছিল সজারু, হয়ে গেল হাঁসজারু'র মতো গ্যামাজ

আর ম্যাজিক একসঙ্গে জুড়ে লন্ডনের বিখ্যাত গ্যামাজ কোম্পানির ম্যাজিক বিভাগের ক্যাটালগটি নাম নিয়েছিল 'গ্যাম্যাজিক'। আমার এক কাকা বিদেশ থেকে এটি নিয়ে এসেছিলেন। তার পুরনো কাগজপত্রের প্রচ্ছদপট জুড়ে ছিল ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের সেন্ট জর্জেস হলে রাজদম্পতির সম্মানপ্রদর্শনীতে ('রয়্যাল কম্যান্ড পারফরম্যান্স') যাদুপ্রদর্শনরত ইংল্যান্ডের সেরা যাদুকর ডেভিড ডেভান্টের পূর্ণাঙ্গ ফটোগ্রাফ এবং ভেতরের পৃষ্ঠাগুলোতে ছিল ছোট মাঝারি আর বড় নানা ধরনের যাদুক্রীড়ার বিবরণসহ বিভিন্ন যাদুদ্রব্যাদির এবং যন্ত্রপাতির মূল্যতালিকা। ঠাণ্ডা ছাপার হরফে রাগরাগিণীর রূপবর্ণনা পড়ে তারপর গুণী সংগীতশিল্পীর কণ্ঠে তাদের সুন্দর রূপায়ণ শুনলে যেমন হয়, 'গ্যাম্যাজিক' পড়ার পর ছাপার হরফে বর্ণিত একাধিক যাদুর খেলাকে গুণী যাদুকর 'রয় দি মিস্টিক'-এর হাতে রূপ নিতে দেখে আমার তেমনি অবস্থা হলো। যাদুবিদ্যাকে একটি জীবন্ত শিল্পরূপে ভালোবেসে ফেললাম।

'রয় দি মিস্টিক'-এর বিস্ময়কর যাদুর খেলা দেখে এবং 'গ্যাম্যাজিক'-এর সচিত্র পৃষ্ঠাগুলোর মাধ্যমে ডেভিড ডেভান্ট, হাউয়াড থার্স্টন, হ্যারি হুডিনি, 'চুং লিং সু', 'লাফায়েৎ', কার্ল হার্টজ্, ওকিতো, নিকোলা, হারম্যান, নেলসন ডাউনস প্রমুখ পাশ্চাত্য যাদুগগনের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে—যদিও সে পরিচয় নিতান্তই পরোক্ষ এবং একতরফা—আমারও প্রাণে শখ জেগেছিল অন্তত একজন যাদুজোনাকি হওয়ার। তাই ডাকযোগে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত হলাম পূর্বোল্লিখিত গ্যামাজ কোম্পানির যাদু বিভাগের সঙ্গে এবং পরে লন্ডনের আরও দুটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে—হ্যামলি ব্রাদার্স এবং ড্যাভেনপোর্ট লিমিটেড—যাদের ছিল শুধু যাদু নিয়েই কারবার। যাদুসাহিত্যে এবং যাদুসংক্রান্ত অনেক কিছুতেই আমার পড়ার ঘর ভরে উঠতে লাগল। তারপর চলে গেলাম লন্ডন থেকে লস অ্যাঞ্জেলস (ক্যালিফোর্নিয়া), সিনেমাতীর্থ হলিউডের কাছাকাছি থেয়ারের যাদুতীর্থে, অর্থাৎ তখনকার দিনের পৃথিবীর বৃহত্তম যাদুকারখানা থেয়ার্স ম্যাজিক স্টুডিওতে (অবশ্য ডাকযোগে)। তার সচিত্র ক্যাটালগখানার পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল প্রায় দু'শ—ক্ষুদ্রতম 'পকেটট্রিক' থেকে বৃহত্তম 'স্টেজ ইলিউশন'-এর বিবরণ এবং মূল্যতালিকা ছিল তাতে। এর ওপর থেয়ারের স্টুডিও থেকে মাসে অন্তত একটি করে চমৎকার সচিত্র বুলেটিন পেতে লাগলাম, যাতে থাকত যাদুশিল্পে এবং যাদুসাহিত্যে নতুন সংযোজনের বিবরণ। থেয়ারের ঐ যাদু বুলেটিনগুলো দেখে যাদু-দুনিয়ার অগ্রগতি সম্বন্ধে নিয়মিতভাবে ওয়াকিবহাল থাকা যেত। এ থেকে বুঝতে পেরেছিলাম ইউরোপ এবং আমেরিকায় শিল্প এবং ব্যবসায়রূপে যাদুবিদ্যার যে বিরাট সমাদর এবং প্রসার, তার তুলনায় আমাদের দেশে প্রায় কিছুই নয়।

লন্ডনের 'ম্যাজিশিয়ান' নামক যাদুবিষয়ক মাসিকপত্রে (বিখ্যাত গ্যামাজ লিমিটেডের যাদু বিভাগ থেকে প্রকাশিত) সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ সংখ্যায় এবং তার

পরে যাদু-সংক্রান্ত আমার কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে আমার পরিকল্পিত কয়েকটি যাদুর খেলার কৌশল ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলাম। আমার সেই লেখাগুলো বিশ্বের যাদুজগতে যুগান্তর এনেছিল বলে খবর পাইনি, কিন্তু আজও আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করি লন্ডনের বিশিষ্ট যাদু-মাসিকে একজন বাঙালি যাদু-শৌখিনের লেখা হিসেবেই হয়তো আমার সেই লেখা বাংলার অতুলনীয় যাদুকর রাজা বোস দেখেছিলেন এবং মনে রেখেছিলেন, এবং কতকটা হয়তো এরই ফলে তাঁর মৃত্যুর (১৯৪৮) পূর্বের কয়েক বছর তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে তরুণ বয়সে বিলেতে চামড়ার কাজ শিখতে গিয়ে সেখানে যাদুর চর্চা এবং সমাদর দেখে উৎসাহিত হয়ে লেদার এক্সপার্ট হওয়ার রাস্তা ছেড়ে তিনি বেছে নিলেন যাদুর রাস্তা। অবশ্য দেশে থাকতেই যাদুবিদ্যা কিছুটা রপ্ত করেছিলেন। পেশাদার যাদুকররূপে বছর কয়েক ইংল্যান্ডে এবং ইউরোপের অন্যান্য জায়গায় ঘুরে ঘুরে যাদুপ্রদর্শন করে তারপর বাংলার ছেলে বাংলায় ফিরে আসেন এবং বাকি জীবনটা যাদুর চর্চাতেই কাটিয়ে দেন। জীবনের শেষ কয়েক বছর অবশ্য তিনি পেশাদারি যাদুপ্রদর্শন থেকে বানপ্রস্থ নিয়েছিলেন শারীরিক এবং অন্যান্য কারণে। বাংলার যাদুচর্চার ইতিহাসে যাদুকর পি. সি. সরকারের আগে বাংলার যাদুজগতে জনপ্রিয়তম দুটি নাম ছিল গণপতি চক্রবর্তী আর রাজা বোস। এঁদের দুজনের স্টাইল বা খেলা দেখাবার ভঙ্গি ছিল আলাদা এবং নিজ নিজ স্টাইলে এঁরা দুজনই ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এঁদের সমসাময়িক আরেকটি জনপ্রিয় নাম প্রফেসর বিমল গুপ্ত (পুরো পদবি দাশগুপ্ত)। ইনি শুধু সুদক্ষ যাদুকর ছিলেন তাই নয়, ‘হিজ মাস্টার্স ভয়েস’ রেকর্ডের বিশিষ্ট গায়ক এবং বাংলার অন্যতম প্রধান কৌতুকশিল্পী হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা ছিল অসামান্য। রাজা বোসের যাদুপ্রদর্শন, চলাফেরা এবং কথার গতি ছিল দ্রুত—বিখ্যাত মার্কিন যাদুকর হোরেস গোলডিনের (Horace Goldin) মতো; প্রফেসর গুপ্তের এই তিনটির গতিই ছিল শান্ত-ধীর—অবিস্মরণীয় ইংরেজ যাদুকর ডেভিড ডেভান্টের (David Devant) মতো। যাদুবিদ্যার ক্ষেত্রে এঁর সংস্পর্শে এসে বিশেষ লাভবান হয়েছিলেন বাংলার দুজন বিশিষ্ট যাদুকর—অশোক রায় (Osak Rae) এবং বিমলাকান্ত রায় চৌধুরী। (Becaire)।

ছেলেবেলায় একবার পূর্ববাংলার একটি গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলাম। বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম, কবি দ্বিজেন্দ্রলালের ‘ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা’ মনে করিয়ে দেওয়ার মতো। তখন যে চোখ ছিল সে চোখ আর নেই, তখন যে মন ছিল সে মনও আজ নেই, শুধু রয়ে গেছে তখনকার অনেক স্মৃতি—কিছু ঝাপসা, কিছু পরিষ্কার। সেই গ্রামে যাদের দেখেছিলাম তাদের ভেতর সবচেয়ে বেশি স্পষ্টভাবে মনে আছে সেখানকার শিবমন্দিরের সন্ন্যাসী বাবার কথা। মন্দিরের ধারে বটগাছের তলায় একটা বেড়ার ঘরে থাকতেন তিনি এবং তাঁর একজন চেলা। গুরুর ঐকান্তিক

সেবা ছাড়া চেলাটির জীবনে অন্য কোনো লক্ষ্য বা বাসনা ছিল বলে মনে হতো না। শুনেছিলাম সন্ন্যাসী বাবা একবার নিদারুণ বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তখন নিজের জীবন বিপন্ন করে সম্পূর্ণ একা তাঁর সেবা করে চেলাটি তাঁকে সারিয়ে তুলেছিল, অপর কাউকে বসন্ত-আক্রান্ত গুরুদেবের সেবায় লাগতে দেয়নি। সম্ভবত অপর কারও জীবন পাছে বিপন্ন হয়—বসন্ত ভয়ানক ছোঁয়াচে রোগ—সেই জন্য, অথবা হয়তো গুরুদেবের সেবার পুণ্য আর গৌরবে অপর কেউ এসে ভাগ বসাবে, এ কল্পনাও তার সয়নি। যাই হোক, মায়ের দয়া থেকে সন্ন্যাসী বাবাকে সে সারিয়ে তুলেছিল। আশ্চর্যের বিষয়, গুরুর বসন্তের ছোঁয়াচে চেলার বসন্ত হয়নি, একটি ফুসকুড়িও দেখা দেয়নি তার গায়ে। এতে গ্রামসুদ্ধ সবাই বিস্মিত হয়েছিল এবং এ বিষয়ে গ্রামের মাতব্বরস্থানীয় ব্যক্তিরা মন্তব্য করেছিলেন যে, অমন সাংঘাতিকভাবে আক্রান্ত বসন্ত রোগীর সেবা করেও যে চেলাটি বসন্তর হাত থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ থেকেছিল, এ সন্ন্যাসী বাবারই অলৌকিক শক্তির ফল; আসলে ঐ চেলার ওপরই মা দয়া করবেন বলে ঠিক করেছিলেন, সন্ন্যাসী বাবা অলৌকিক ক্ষমতাবলে তা টের পেয়ে তেমনি অলৌকিক ক্ষমতাবলেই মায়ের দয়াকে নিজের দেহে টেনে নিয়েছিলেন শিষ্যকে বাঁচাবার জন্য। ধন্য গুরু! ধন্য শিষ্য।

সন্ন্যাসী ঠাকুরের একটিমাত্র নামই গ্রামের লোকের জানা ছিল, সে নাম সন্ন্যাসী বাবা। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই নামেই ডাকত তাঁকে, এই নামেই চিনত। চেলাটির নাম ছিল শিবদাস। এ নাম পিতৃদত্ত নয়, গুরুদত্ত। সন্ন্যাসী বাবা নাকি বলেছিলেন, 'তুই শিবের দাস, তাই তোর নাম হলো শিবদাস।' চেলা বলেছিল, 'গুরুদেব, আমি আর কাউকে চিনিনে, আমি শুধু আপনারই দাস, যেমন আছে কবীরের দোহায় :

'গুরু গোবিন্দ দৌউ খড়ে, কাকে লাগোঁ পাঁয়।
বলিহারী গুরু আপনে, গোবিন্দ দিয়ো বতায়।'

অর্থাৎ 'গুরু এবং গোবিন্দ দুজন সামনে খাড়া, এখন কার পায়ে আমি প্রণাম করব? হে গুরু, আপনাকে ধন্যবাদ, আপনিই গোবিন্দকে লাভ করবার পথ আমাকে বাতলে দিয়েছেন, আপনার কৃপা ছাড়া এ পথ আমি কিছুতেই পেতাম না। সুতরাং প্রণাম আমি আপনাকে করব।'

সন্ন্যাসী বাবা হেসে বলেছিলেন, 'ওরে ব্যাটা, তোর গুরুভক্তি সাচ্চা তা আমি জানি। তোর গুরুই তোর নাম দিচ্ছে শিবদাস।' সুতরাং শিবদাস নামই শিরোধার্য করে নিয়েছিল সেই চেলাটি।

আমি গ্রামে যেদিন পা দিয়েছিলাম সেদিনই এসব কথা শুনেছিলাম, সন্ন্যাসী বাবার সম্বন্ধে আরও নানা রকম লৌকিক এবং অলৌকিক কাহিনির সঙ্গে। শুনেছিলাম এ গ্রামে সন্ন্যাসী বাবা যখন প্রথম এসে ঠাঁই নিয়েছিলেন বটগাছের তলায়, সঙ্গে তাঁর এই চেলা শিবদাস এবং মুখে মাঝে মাঝে উচ্চারিত 'ব্যোম ভোলা

শিব মহেশ্বর' মন্ত্র, তখন তাতে সামান্য কয়েকজন মাত্র উৎসাহিত হয়েছিলেন; তাও সাধারণভাবে, তেমন জোরালোভাবে নয়। তারপর একদিন এক অসাধারণ ব্যাপার ঘটল। গ্রামের অনেকের চোখের সামনে একদিন সন্ন্যাসী বাবার অলৌকিক শক্তির যাদুতে এক ডজন তামাক ধরাবার টিকে পরিণত হয়ে গেল এক ডজন খাঁটি বাতাসায়। উপস্থিতদের ভেতর কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি নিজ মুখে খেয়ে দেখলেন সেগুলো সত্যিই বাতাসা, চোখের ভুল নয়। খবরটা জঙ্গলে দাবানলের মতো গ্রামময় দ্রুতবেগে ছড়িয়ে পড়ল : সন্ন্যাসী বাবা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ, টিকেকে মন্ত্রবলে বাতাসা বানিয়ে দিয়েছেন!

এতদিনে যা হয়নি, একদিনের ঐ যাদুর খেলায় তাই হয়ে গেল। দ্রুতবেগে সারা গ্রামের পরমপূজ্য হয়ে উঠলেন সন্ন্যাসী বাবা, ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ। গ্রামের অনেকে এসে সন্ন্যাসী বাবার পায়ে ধরে পড়ল, আশ্রয় দিতেই হবে শ্রীচরণে। আশ্রয় মানে আধ্যাত্মিক আশ্রয়, মন্ত্র-দীক্ষা। ভক্তের পর ভক্ত নাছোড়বান্দা। তাদের চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে দীক্ষা দিতে শুরু করলেন সন্ন্যাসী বাবা। মন্ত্র হয়তো অন্য কিছু নয়, প্রত্যেক শিষ্য বা শিষ্যাকেই হয়তো ঐ একটি মন্ত্র তিনি জপ করতে উপদেশ দিতেন : 'ব্যোম ভোলা শিব মহেশ্বর।'

আমার দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল সেই সন্ন্যাসী বাবাকে। যে বাড়িতে আমি উঠেছিলাম, তার পাশের বাড়ি সন্ন্যাসী বাবার শিষ্যবাড়ি। বাড়ির বড় কর্তা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। গ্রামের অ্যালোপ্যাথ কৃতান্ত ডাক্তার এসে জিভ দেখে, বুকে স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে, পেটে টোকা মেরে আর নাড়ি টিপে প্রেসক্রিপশন করে গেছেন, তাঁর ডিসপেনসারি থেকে ছয় দাগ মিক্‌স্‌চার আনিয়ে দুদাগ খাওয়ানোও হয়ে গেছে, কিন্তু কর্তা তবু অশান্ত। তাঁর দেহ যত ছটফট করছে, মন ছটফট করছে তার চাইতে বেশি। তাঁর মন বলছে এ-যাত্রা অ্যালোপ্যাথি-ফ্যালোপ্যাথির কর্ম নয়, ওষুধে কিচ্ছু হবে না, এ ফাড়া কাটিয়ে উঠতে হলে একমাত্র ভরসা গুরুকৃপা এবং তাঁর মন যা বলছে সেইটে যথাসাধ্য জোর গলায় মুখে বলে তিনি বাড়িসুদ্ধ সবাইকে শোনাচ্ছেন।

কর্তার কথা শুনে গৃহিণী বিশেষ উদ্বিগ্ন। কর্তার মতো তিনিও গুরুভক্ত। কিন্তু অ্যালোপ্যাথিক ওষুধে কিচ্ছু হবে না, কর্তার এই কথাটা শেলের মতো বিঁধছে অ্যালোপ্যাথ কৃতান্ত ডাক্তারের বুকে। এ গাঁয়ের সবাই তাঁকে বলে ধন্বন্তরী—না বলে উপায়ও নেই, কারণ এ গাঁয়ে তিনিই একমাত্র ডাক্তার—তাঁর ওষুধে কিচ্ছু হবে না, এমন কথা এ গাঁয়ের আর কেউ কখনো বলেনি। এ কথা বলে বাবা যেন একটা প্রচণ্ড চ্যালেঞ্জ ছুড়ে মেরেছেন কৃতান্ত ডাক্তারের মুখের ওপর। কৃতান্ত ডাক্তারও তাই পাল্টা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলে গেছেন, তিনি যে মিক্‌স্‌চারটি দিয়েছেন সেটি একেবারে মোক্ষম দাওয়াই, তাতে যদি 'কিচ্ছু' না হয় তাহলে তিনি দুহাতে চুড়ি পরবেন।

কর্তা বলেছেন, 'গিন্নি, আমি টেঁসে গেলে তারপর কেতান্ত ডাক্তার দুহাতে চুড়ি পরলেই বা তোমার কী ফায়দা?' গিন্নি ভেবে দেখেছেন কথাটা কর্তা মন্দ বলেননি।

কর্তার বড় ছেলে উচ্চশিক্ষিত, অর্থাৎ ম্যাট্রিক ফেল।

উচ্চশিক্ষা লাভ করে তার একটু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি হয়েছে। সন্ন্যাসী বাবার ওপর তার ভক্তির অভাব নেই। আধ্যাত্মিক ব্যামোতে তাঁর আধ্যাত্মিক প্রভাব ফলপ্রদ হবে এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ, কিন্তু দেহের ব্যামোতে অ্যালোপ্যাথির চাইতে সন্ন্যাসী বাবার অধ্যাত্মোপ্যাথি বেশি কার্যকরী হবে এটা তার ম্যাট্রিক ফেল মন কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। পিতৃভক্তিরও অভাব নেই তার, কিন্তু পিতৃদেবের এই অ্যালোপ্যাথি তাচ্ছিল্য এবং 'গুরু কৃপাহি কেবলম্' তার ভালো লাগছে না। মা বলেছিলেন, 'খোকা, আমার মনে হয় কেতান্ত ডাক্তারের মিক্স্চার বন্ধ করে বরং গুরুদেবের চরণাম্মেত—' আর খোকা মাকে প্রায় ধমক দিয়েই থামিয়ে দিয়েছিল, গুরুদেবকে খবর পাঠাতে রাজি হয়নি।

খোকা বিকেলবেলা কৃতান্ত মিক্স্চারের তৃতীয় দাগ খাওয়াতে গেল কর্তাকে। বড় ছেলের হাতে কর্তা তৃতীয় দাগ খেলেন, কিন্তু দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করতে লাগলেন, 'এ ওষুধে কিচ্ছু হবে না। গুরু কৃপাহি কেবলম্। গুরুদেব—গুরুদেব—গুরুদেব!'

বড় ছেলে কিছুক্ষণ তৃতীয় দাগের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে তারপর বলল, 'এখন একটু ভালো বোধ করছ তো বাবা?' কৃতান্ত ডাক্তার জোর গলায় বলে গেছেন, তিন দাগ ওষুধ খাওয়ার পর কর্তা যদি প্রচুর আরাম বোধ না করেন তাহলে মেটিরিয়া মেডিকা মিথ্যে, ফারমাকোপিয়া মিথ্যে।

কর্তা অবসন্ন হতাশ-ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে বললেন, 'ভালো নয়, ভালো নয়, একেবারে ভালো নয়। অ্যালোপ্যাথির বাবাও এখন—কিছু করতে পারবে না। এখন শুধু—গুরু কৃপাহি কেবলম্! জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু।'

এমন সময় অলৌকিক ব্যাপার। বড় কর্তা তৃতীয়বার 'জয় গুরু' উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই জলদ-গম্ভীরস্বরে ধ্বনিত হলো, 'ব্যোম ভোলা শিব মহেশ্বর। ব্যোম ব্যোম ব্যোম!'

চমকিত হয়ে পিছনদিকে তাকিয়ে দেখা গেল দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে একজন দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী। রোগশয়ান বড় কর্তা বিস্ময়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, 'গুরুদেব! গুরুদেব! গুরুদেব! ভক্তের ডাক আপনি শুনতে পেয়েছেন!'

গুরুদেব অর্থাৎ সন্ন্যাসী বাবা স্নিগ্ধ প্রশান্ত-কণ্ঠে বললেন, 'পেয়েছি।'

শুনে আমার নাবালক মন সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। বড় কর্তার বাড়ি থেকে সন্ন্যাসী বাবার আস্তানা বেশ কিছুটা দূর। রোগশয়ান বড় কর্তার ডাক অত দূর থেকে কী করে তিনি শুনতে পেলেন, আর শুনতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই

এতটা পথ পেরিয়ে কী করে এসে হাজির হলেন, তার কোনো লৌকিক ব্যাখ্যা খুঁজে পেলাম না।

মনে হলো বড় কর্তার বড় ছেলেও বিস্মিত হয়েছে; অন্তত বিব্রত তো বটেই।

আবদেরে ছেলে তার আবদার-সহিষ্ণু বাপকে দেখে যেমন করে থাকে, অনেকটা তেমনি করে বড় কর্তা কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বললেন, 'আমি আর বাঁচব না। এ-যাত্রা আমি বাঁচব না গুরুদেব।'

চৌকাঠ পিছনে ফেলে রোগীর শয্যার দিকে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন সন্ন্যাসী বাবা। দুই চোখে আশ্চর্য করুণা-মধুর দৃষ্টি। মুখে অতুলনীয় হাসি। বললেন, 'আরও অনেকদিন বাঁচবি।'

বড় কর্তা বললেন, 'যদি আপনি দয়া করে বাঁচান, গুরুদেব।'

সন্ন্যাসী বাবা বললেন, 'বাঁচাব।'

'কিন্তু গুরুদেব—' বললেন বড় কর্তা।

'কিন্তু নয়,' বললেন সন্ন্যাসী বাবা, 'বাঁচবি।'

বড় কর্তা বললেন, 'গুরুদেব, আর খাব না কেতান্ত ডাক্তারের মিক্‌স্‌চার।'

সন্ন্যাসী বাবা বললেন, 'আলবৎ খাবি।' শুনে খুশি হয়ে উঠল কর্তার বড় ছেলে। কারণ গুরুদেবের হুকুম বাবা তামিল না করে পারবেন না।

বড় কর্তার মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করে অভয় দিয়ে চলে গেলেন সন্ন্যাসী বাবা। যাবার পথে বড় গিন্নি একটি পাত্রে জল নিয়ে সন্ন্যাসী বাবার ডান পায়ের কাছে ধরে প্রার্থনা জানালেন, 'শ্রীচরণের বুড়ো আঙুলটা জলে একটু ডোবান বাবা।'

ডোবালেন সন্ন্যাসী বাবা। সবটা জল চরণামৃত হয়ে গেল। চলে গেলেন সন্ন্যাসী বাবা।

কর্তাকে এক চামচ চরণামৃত সেবন করিয়ে দিলেন গিন্নি। তারপর দুদিনে পুরোপুরি ভালো হয়ে উঠলেন বড় কর্তা। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার।

কৃতান্ত ডাক্তার বুক ফুলিয়ে বললেন, 'বলেছিলাম না, ঐ মিক্‌স্‌চার যদি মোক্ষম না হয় তাহলে দুহাতে চুড়ি পরব?'

বড় কর্তার ম্যাট্রিক ফেল বড় ছেলেও কৃতান্ত ডাক্তারের কৃতিত্বে কৃতজ্ঞ এবং মুগ্ধ। কিন্তু বাড়ির গিন্নিমার নিশ্চিত বিশ্বাস কর্তাকে সারিয়ে তোলার পুরো কৃতিত্ব যদি কেউ দাবি করতে পারে তো সে সন্ন্যাসী বাবার চরণামৃত।

কর্তা বললেন, 'ঐ যে গুরুদেব বলেছিলেন 'বাঁচবি', ব্যস, ঐতেই যমের মুখে লাথি। ওঁর শ্রীমুখের বাণী তো মিথ্যে হবার নয়। চরণামৃতটা হলো তারপর উপলক্ষ্য মাত্র। তবে হ্যাঁ—চরণামৃত খেয়েই এত তাড়াতাড়ি সেরে উঠলুম বটে।'

গিন্নি বললেন, 'আমার তো মনে হয় এ গাঁয়ে বাবা থাকতে কেতান্ত ডাক্তারের কোনো দরকার নেই। বাবার চরণাম্মেত খেলেই সব ব্যামো ভালো হয়ে যায়।'

কর্তা বললেন, 'গুরুদেব রাজি হবেন না। জানো তো ওঁর কী রকম দয়ার শরীর? দেখলে তো আমায় জোর হুকুম করে কেতান্ত ডাক্তারের মিক্স্চার পুরো খাইয়ে ছাড়লেন? নইলে কেতান্ত ডাক্তার খাবে কী?'

আজ মনে হচ্ছে বড় কর্তা যে অত তাড়াতাড়ি সেরে উঠেছিলেন তার মূলে কৃতান্ত ডাক্তারের ওষুধের গুণ থাকা অসম্ভব নয়। অথবা ওটা হয়তো বিশ্বাসের ফলে আরোগ্যের (ইংরেজিতে যাকে বলে 'ফেইথ কিওর') একটি উদাহরণ। কিংবা হয়তো অসুখ ঠিক ঐ সময় এমনিতেই সারত, শুধু ঐ যোগাযোগের ফলে 'ঝড়ে কাক মরল, আর ফকিরের কেরামত বাড়ল'।

কিন্তু সন্ন্যাসী বাবা কী করে শুনতে পেয়েছিলেন কর্তার ডাক? আর কী করে অত তাড়াতাড়ি এসে উপস্থিত হয়েছিলেন ডাকের মুখোমুখি? আমার মনে হয় গিন্নিই গোপনে তার অনেকক্ষণ আগে সন্ন্যাসী বাবাকে নিয়ে আসবার জন্য লোক পাঠিয়েছিলেন, কর্তাকে বা বড় ছেলেকে না জানিয়ে।...

পাশের বাড়িতে সেই প্রথম দেখার পর আরও কয়েকবার সন্ন্যাসী বাবাকে দেখেছিলাম, তাঁর সম্বন্ধে আরও অনেক কথা শুনেছিলাম, তাঁর চরিত্র-মাধুর্যের এবং নিঃস্বার্থ মহত্ত্বেরও অনেক প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছিলাম। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এবং আদর্শে সেই গ্রামের বহু উন্নতি, বহু উপকার হয়েছিল। তিনি 'মহাপুরুষ' ছিলেন কি না জানি না, কিন্তু মহৎ লোক ছিলেন সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আমি সেই গ্রাম থেকে ফিরে আসবার বছর-কয়েক পর গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাইকে কাঁদিয়ে তিনি দেহরক্ষা করেছিলেন। সামান্য কয়েকটা দিন তাঁকে দেখেছিলাম, তবু এত বছর পরেও আমার স্মৃতি থেকে তিনি মুছে যাননি। তাঁর কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটি মনে করে কৌতুক বোধ করি যে, তাঁর চরিত্রের মহৎ গুণাবলির সমস্ত পরিচয় ছাপিয়ে উঠেছিল এই একটি পরিচয় যে, তিনি টিকেকে বাতাসা বানাবার যাদু জানেন। তাঁর পসারের (পসার কথাটা এখানে শ্রেষ্ঠতম অর্থে ব্যবহার করছি) পত্তন করে দিয়েছিল একটি সাধারণ যাদু বা ভোজবাজির খেলা, যার ভেতর অলৌকিক কিছুই ছিল না। অথবা হয়তো যে সময়ে যে পরিবেশে যে আবহাওয়ায় তিনি টিকেকে বাতাসায় পরিণত করেছিলেন, তাতে বিশেষ করে তাঁর ব্যক্তিত্বের গুণে—সাধারণ লৌকিক যাদুর খেলাকেই অসাধারণ, অলৌকিক যাদু বলে মনে হয়েছিল সবার। সন্ন্যাসী বাবা কোনকালে হয়তো শখ করে যাদুর খেলা দুটো-চারটে শিখেছিলেন, আমরা বিদেশি ভাষা থেকে ধার করে আজকাল চলতি কথায় যাকে 'ম্যাজিক' বলি। হয়তো তিনি একদিন (অথবা এক রাতে) তামাশা করে একটি টিকেকে বাতাসা বানিয়েছিলেন, তখন হয়তো ভাবতেও পারেননি তাঁর অলৌকিক (?) শক্তির ঐ প্রত্যক্ষ প্রমাণের ফল অমন সুদূরপ্রসারী হবে। অর্থাৎ কৌতুকছলে যে হাত-সাফাইয়ের খেলা দেখিয়েছিলেন,